

অধ্যায়: ৮

বিপদ-ঝুঁকি, পালিয়ে যাওয়া, হত্যা ও বেঁচে যাওয়া

১৯৭১ সালে ঢাকায় পাকিস্তানি আক্রমণ এবং তারপর গোটা দেশে কর্তৃত পুনর্স্থাপনের ফলে নানা ধরনের বিপদ ও ঝুঁকির কথা জানা যায়। তবে সবচেয়ে প্রধান ছিল প্রাণ যাওয়ার ঝুঁকি। এছাড়া বাড়ি পোড়ানো, সম্পদ লুট হওয়া, ধরে নিয়ে যাওয়া ও নির্যাতন রয়েছে। সবচেয়ে নাজুক ঝুঁকি বা বিপদ ছিল নারীদের ধর্ষণের ভয়।

গ্রামীণ পর্যায়ে স্থানীয়দের পাকিস্তানপত্রিকা নির্যাতন করেছে সর্বক্ষেত্রে। গ্রামে পাকিস্তান আর্মি গেলে সেই মাত্রা বেড়ে যেত। পিস কমিটির নির্দেশ, উসকানি বা ছত্রচায়ায় সরাসরি গ্রামের মানুষদের ওপর নির্যাতন করত রাজাকাররা। তারা গ্রামের নিম্নবর্গ থেকে উঠে আসা মানুষ। কিন্তু রাজাকার হওয়ার সুবাদে তারা ক্ষমতাবান হয় এবং সব ধরনের নির্যাতনকর্মে জড়িয়ে পড়ে। মুক্তিবাহিনী গ্রামে এলে তাদের খোঁজ নেওয়া রাজাকারদের প্রধান কাজ ছিল। তবে লুটতরাজে তাদের বেশি আগ্রহ দেখা যায়। তারা জানত যে তাদের শাসন করার কেউ নেই, পিস কমিটি বা আর্মি ছাড়া, যারা ছিল তাদের নির্দেশদাতা ও ক্ষমতার উৎস।

রাজাকারদের যারা নিয়ন্ত্রণ করত অর্থাৎ পিস কমিটি, তারা ছিল অনেক ক্ষেত্রে গ্রামের প্রধান নির্যাতনকারী। পিস কমিটির সদস্যরা হত্যা বা নির্যাতন সরাসরি নিজেরা করত না, এটা ঘটাত রাজাকারদের মাধ্যমে। পিস কমিটির সদস্যরা শুধু নির্যাতনই করেনি, পাশাপাশি গ্রামীণ রাজনীতি বা কোন্দল বা শক্রতা মিটিয়েছিল এই সুযোগে। অর্থাৎ রাজাকারদের তুচ্ছ করাটা ছিল বিপজ্জনক। পিস কমিটির কোনো আদেশ পালন না করাটা ছিল আরও বিপদের। এ কারণে পিস কমিটি বা রাজাকারদের সঙ্গে কেউ শক্রতা করত না। ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য অনেকে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখত।

বিপদে পড়লে বাঁচার একমাত্র উপায় ছিল পালিয়ে যাওয়া। এই পালানো ছিল ১৯৭১ সালের সবচেয়ে বড় বাস্তবতা, যার উল্লেখ বারবার আসে। মানুষ পালিয়েছে যেখানে সম্ভব সেখানে। কেউ পালিয়েছে পাশের গ্রামে, কেউ পাশের বাড়িতে বা বনে। দূরে কোনো আত্মীয় থাকলে তাদের বাড়িতে গিয়েও লুকিয়েছে মানুষ। যাদের সেই সুযোগ ছিল না তারাও পালিয়েছে। হয়তো সে আশ্রয় নিয়েছে অপরিচিত কোনো ব্যক্তির ঘরে।

লুটের ভয়ে সম্পদ থাকাটা যেমন ঝুঁকিপূর্ণ ছিল, তেমনি বিপদ ছিল পাকিস্তান-বিরোধী কারো সঙ্গে আত্মীয়তা বা সম্পর্ক রাখা। আত্মীয়তার কারণে মানুষকে নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হত্যা করা হয়েছে।

রাজাকাররা বিভিন্ন সময় বাড়িতে চাঁদা তুলেছে। খাবার দাবি করেছে এবং সম্পদ থাকলে নিয়ে গেছে জোর করে। এদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাটা ছিল আরও বিপদের। দু-একটি স্থানে রাজাকারদের প্রতিবাদ করতে গিয়ে তারা হত্যা-নির্যাতনের শিকার হয়।

তরুণ ও হিন্দুদের বিপদ

বিপদ বেশি ছিল তরুণদের। কারণ তাদের মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বেশি। অর্থাৎ পাকিস্তানিদের আগামীর শক্তি। তাই অনেকেই পালিয়ে থেকেছে। বাড়িতে থেকেছে কেবল নিরাপদ বোধ করলে। বয়স্করা এমন ঝুঁকিতে ছিল না। তবে হিন্দু জনগোষ্ঠীর বৃন্দরা ছিল অনেক বিপদে। নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা দীর্ঘ সময় অতিক্রম করে ভারতে যেতে বাধ্য হয়েছে। পথে অনেকের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে, কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে মারা গেছে। অনেককে তাদের পরিবার ভারতে নিয়ে যেতে পারেনি অসুস্থতার কারণে। কেউ কেউ দেশেই থেকে গেছে।

বিপদ ও ঝুঁকি এতই সর্বাত্মক ছিল যে দোষী-নির্দোষ সবাই এতে ভুগেছে। এ ধরনের অনেক নির্যাতনের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু বিপদ ও ঝুঁকি কেবল প্রাণভয় বা নির্যাতনের ছিল না। অর্থাৎ সামাজিক বিপদ ও ঝুঁকি ছিল সমানভাবে।

যুদ্ধের সময়ে অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মানুষের আয় কমে যায়। যাতায়াতের বিপদের কারণে পেশা ও ব্যবসায় ক্ষতি হয়। তেমনিভাবে সামাজিক কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ওই সময়ে চিকিৎসা পাওয়া ছিল অনেক ক্ষেত্রে কঠিন। বাজার পুড়িয়ে দিলে মানুষের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়, যার ফলে এ অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত পরিবার ও গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব বাস্তবতার পাশাপাশি ছিল নিরাপদ আশ্রয় সন্ধান।

এই আশ্রয় কেবল আত্মীয় বা পরিচিতরাই দিত না, অচেনা গ্রামের মানুষরাও আশ্রয় দিয়েছে। এটি প্রায় প্রতিটি গ্রামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সবচেয়ে নাজুক ও বিপদগ্রস্ত আশ্রয়প্রার্থী ছিল হিন্দু জনগোষ্ঠী। হিন্দুদের বেশির ভাগ আশ্রয় পায় মুসলমানদের বাড়িতে। তবে পাকিস্তানিনা যখন হিন্দু নিধন ও নির্যাতনের কৌশল গ্রহণ করে এবং আশ্রয়দানকারীদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা ঘটায় তখন আশ্রয় দেওয়ার অপারগতার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এটি ছিল খুবই অল্প।

বিপদ ও বুঁকি এড়াতে মানুষ নানা কৌশল গ্রহণ করে। তারা রাজাকারদের নির্যাতনের ভয়ে রাতভর ব্রিজ বা গ্রাম পাহাড়া দিতে বাধ্য হয়েছে। একই কৌশল হিসেবে তারা প্রয়োজনে পিস কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রাখার চেষ্টা করেছে। যদিও তারাই গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছে বা নানাভাবে সহায়তা করেছে অনেক ক্ষেত্রে।

যুদ্ধকালে বাংলাদেশের সব মানুষ বিপদে ছিল এবং এই অনিশ্চয়তা তাদের অস্বাভাবিক জীবনযাপনে বাধ্য করেছিল। তবে দুর্বল হয়ে পড়লেও সমাজকাঠামো একেবারে ভেঙে পড়েনি। গ্রাম আক্রান্ত হলেও মানুষ সেখানে থেকেছে। এ কারণেই একত্র হয়ে যুদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে।

গ্রামের সব বিপদ, বুঁকি, দুর্বলতা, মানবতাবোধ, আশ্রয়, সাহস, প্রতিরোধ ও সহায়তার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই অর্থে গ্রাম হয়ে ওঠে বাংলাদেশের প্রামাণ্য চিত্র।

পালিয়ে যাওয়া

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের বাহার আলী মিস্ট্রি পালিয়ে বেড়াতেন রাজাকারের ভয়ে। ওই গ্রামের লোকেরা তোফাজ্জল মোল্লাকে শান্তি কমিটির লোক বলে ধরে নিয়ে যায়। তাই পালিয়ে থাকাটা জীবনের অংশ ছিল। যেমন ওই এলাকার মণ্ডল কৃষক ছিলেন, যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করার। তাই তিনি পালিয়ে যেতেন নিরাপদ কোনো স্থানে।

দৌলতপুরের শেরপুর গ্রামের পঁচি বিবি জানান, ভারতে পালাবার আগে নিজ গ্রামে রাজাকারের আগমনের কথা শুনলেই পালিয়ে যেতেন। আর্থের খেতের মধ্যে অনেকের সঙ্গে পালিয়ে থাকতেন। রাজাকাররা চলে গেলে তবেই ঘরে ফিরতেন।

কুষ্টিয়ার মিরপুরের মজিবর ঘটক জানান, পাকিস্তানপাইদের গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের ঠেকাতে পাহাড়াও দিতে হয়েছে।

মিরপুরের সুফিয়া বেগম জানান, রাজাকাররা জোয়ান মানুষের ওপর চোখ রাখত, কেউ মুক্তিযোদ্ধা কি না। ভারতে পালানোর আগে তার স্বামীর ওপর নির্যাতন হয়েছিল। তাঁকে ধরে নিয়ে ব্রিজের মুখে পুঁতে রেখেছিল। তবে একজন লোক তাঁকে রক্ষা করেছিল। সুফিয়া বেগমকেও মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থক হিসেবে রাজাকাররা তাড়া করেছিল, কিন্তু ধরতে পারেনি।

মিরপুরের হামেজান জানান, যুদ্ধের সময় বৃক্ষরা বাড়িতেই থাকত, তবে জোয়ানরা পালিয়ে যেত ভয়ে। বয়সের কারণে তিনি নিজেকে বাড়ি থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভয় করতেন না। যুদ্ধের সময় মানুষ ভয়ে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারেনি। তবে বাচ্চারা সুযোগ পেলেই মাঠে খেলাধুলা করেছে।

ঘোষবাগ গ্রামের কৃষক আবদুর রশিদ জানান, যুদ্ধের বছর পালিয়ে গিয়ে তিনি পুরোটা সময় চর এলাকায় ছিলেন। গ্রামের চৌকিদাররা নিজেরাই বিপদে থাকত।

নোয়াখালীর জরিনা খাতুন জানান, এলাকায় নিরাপদে চলাফেরা করা যেত না। অনেকটা বন্দির মতো ঘরে থাকতে হতো। পাকিস্তানি আর্মির হত্যা-নির্যাতনের ভয়ে পরে তিনি এলাকা ছেড়ে চলে যান।

কবিরহাটের শিক্ষক ধীরাজ রঞ্জন ভৌমিক জানান, যুদ্ধ শুরুর আগে তাঁদের বাড়িতে আঙুন দেওয়ায় তিনি এলাকা ছাড়েন। কবিরহাট উচ্চ বিদ্যালয়ে ছিল পাকিস্তানি আর্মির ক্যাম্প।

চর ভদ্রাসনের চর হাজীগঞ্জ গ্রামের সাজিদিন বিশ্বাস জানান, আর্মি এলাকায় এলে তাঁরা বাড়ি ছেড়ে চলে যেতেন। আবার আর্মি চলে যাওয়ার খবর পেলে বাড়ি ফিরতেন। এলাকায় চুরি-ডাকাতি বেশি হতো। গ্রামের চৌকিদাররা বাজারে থাকত। কোথায় কজন মারা গেল এসব হিসাব তারা রাখত।

চর ভদ্রাসনের চর অযোধ্যা শীলভাদ্বি গ্রামের দুলাল চন্দ্র শীল জানান, গ্রামে পাহারার ব্যবস্থা না থাকায় ভয়ে সাত-আট মাস তিনি পাশের গ্রামে পালিয়েছিলেন।

পান্তির নরেন্দ্রনাথ কর্মকার যুদ্ধের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিপাড়ায় চাঁদ আলীর বাড়ি পালাতেন।

ডঁশার সামসুন্নাহার নিলু জানান, এসএসসি পরীক্ষা দিতে বিনাইয়ে তাঁর দুলাভাইয়ের বাড়িতে থাকেন। সেখানে তিনি ছাড়াও তাঁর ভাই, দুই বান্ধবী ও তাঁদের ভাই ছিল। তবে বান্ধবীরা আলাদা রান্না করে খেত। পরীক্ষা দিয়ে আসার পরে বাড়িতে একদিন আর্মি আসার কথা শুনে নদীর (গড়াই নদী) ধারে গিয়ে লুকান, পরে গণেশপুর চলে যান।

পালিয়ে বাঁচা

আতাউল হক বিশ্বাসের স্তৰী বলেন, “রোজার মধ্যে একদিন সন্ধ্যায় জাফরের মা (মুজিব বাহিনীর কমান্ডার জাহিদ হোসেন জাফর, পাশের বাড়ির) এসে বলে যে, ‘মিলিটারিরা এসে গেছে, তোমরা ক’নে (কোথায়) যাচ্ছ?’ আমাদের তখন ভাত আর লাউ দিয়ে কৈ মাছ রান্না হয়ে গিয়েছিল। সব ফেলে রেখে দক্ষিণপাড়াতে আরশাদের বাড়িতে গিয়ে উঠি।

“এ বাড়ির আশপাশে জঙ্গল আর জলা কাদা, মোটামুটি একটু নিরাপদ ছিল। সেখানে গিয়ে ছেলের বাপ রান্নাঘরে মাচার নীচে শুয়ে থাকে। সে আওয়ামী লীগের লোকজনদের সাথে চলাফেরা করত। তাছাড়া তার বাপ মাতবর, তাই তাঁকে সব সময় খুঁজত। কিছু সময় পরে আমার খেয়াল হয় যে, বাচ্চা মেয়েটি ঘরে শোয়ানো

রয়েছে আর তার পাশেই হারিকেন জ্বালানো । আমি তখন উচ্চ স্বরে বিলাপ করতে থাকি । কিন্তু ওর বাপকে কোনোভাবেই পাঠানো যাচ্ছে না । পরে কে একজন এসে মেয়েকে দিয়ে যায় । আর এ বাড়ির একজন গিয়ে ভাত-তরকারি নিয়ে আসে । সন্ধ্যারাতে না খেয়ে সারা রাত বসে থেকে ওই ভাত-তরকারি দিয়ে তিন বাড়ির লোক এক মুঠ করে সেহরি খেয়ে সেদিন রোজা রাখি ।”

মুড়ির টিন ও রাজাকার

শুভু ঠাকুর বলেন, “পান্তি বাজার পোড়ানোর দিন আর্মি আসবে শুনে লোকজন পালাতে থাকে । আমিও একদিকে চলে যাই । লোকদের ছোটাছুটি দেখে আমার বৃন্দা মা-ও বাড়ি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য যেতে থাকেন । ডাকুয়া নদীর ধারেই আমি ছিলাম । সবাই চলে গেলেও আমার মা নদী পার হতে পারেননি । পানির মধ্যে দাঁড়ানো মাকে দেখে আমি চিন্কার করে কেঁদে উঠলাম । মায়ের মুখটা রক্তে ভেসে গেছে । আর আমি মনে করলাম যে মা মারা যাচ্ছে । আসলে মা বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় একটিন মুড়ি সাথে নেয় । কিন্তু তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে টিনের এক দিকে লেগে কপাল কেটে যায় । মা তখনো খেয়ালই করেনি । কিন্তু এত রক্ত পড়ছিল যে আমি গুলি লেগেছে মনে করি ।”

চরপাড়ার (সদর থানার) বদর মল্লিক বাড়ির উঠানে কুয়ো কেটে ছেলেমেয়ে নিয়ে আশ্রয় নিতেন । লাঙলের গরু দুটোকে নদীর ভাণ্ডনে খুঁটির সঙ্গে মুখ নীচু করে বেঁধে রাখতেন, যেন গুলি ওপর দিয়ে যায় । একদিন তিনি ও দাউদ খান ঝাউদিয়া শাহী মসজিদে দেওয়ার জন্য দুটি খাসির গোশত দুই হাঁড়িতে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন । অনেক বলার পরও বিভিন্ন কাজের অজুহাতে গ্রামের কোনো লোকই তাদের সাথী হয়নি । কারণ পথে রাজাকারদের ঘাঁটি ও ক্যাম্প ছিল ।

তারা বৈদ্যনাথপুরে গাঙের ধারে বটগাছের কাছে পৌঁছালে কয়েকজন রাজাকার পথ আগলে বলে, “আর যাওয়া লাগবে না । এখানেই দিয়ে যা ।” সশস্ত্র রাজাকাররা মেরে ফেলে নিয়ে যাবে, এই ভয়ে তাঁরা ওদেরকে এক হাঁড়ি গোশত দিয়ে দেন । কিন্তু এরপরে ওদের ক্যাম্প ছিল ও সেখানে আরেক হাঁড়ি দিতে তো হবেই, এমনকি জীবনও যেতে পারে । তাই তাঁরা দুজনে বাকি হাঁড়িটি নিয়ে বাড়ি এসে আশপাশের লোকের কাছে বিলিয়ে দেন ।

যুদ্ধ হওয়ার ভয়ে পালানো

গাড়োয়ান আবুল শাহ জানান, পান্তি বাজার পোড়ানোর তিন-চার দিন আগেই ভাবগতিক দেখে আনসার দফাদার খাগড়বাড়িয়ায় মানিক মোঘার বাড়িতে

সপরিবারে আশ্রয় নেন। তবে তাঁর বৃন্দ বাবা ও পক্ষাধাতগত মা বাড়িতেই ছিলেন। ঠিক বাজারের সঙ্গেই লাগানো বাড়ি বলে বাজারে কিছু হলে বাড়িও আক্রান্ত হতে পারে, এই ভয়ে পালায় তারা। তবে খাগড়বাড়িয়াও নিরাপদ ছিল না, কারণ মুক্তিযোদ্ধারা সেখানে অবস্থান নিয়েছিলেন। তাই ভয়ানক যুদ্ধ হতে পারে ভেবে কচুয়াতে চলে যান তারা। তবে সেদিন তাদের বাড়িতে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

লুকিয়ে থাকা

মহেন্দ্রপুরের পদনাথ বলেন, “এ দিন আমাদের গ্রামের গোপাল, মাধাই, ধূনা, বেগো, মঙ্গল প্রামাণিক ও বিশ্বনাথের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। এ সময়ে আমরা সবাই বাড়ির ধারেই আখক্ষেত্রে মধ্যে পালিয়ে থাকি।”

পান্তি দক্ষিণপাড়ার আতাউল হক বিশ্বাসের স্তৰী জানান, একদিন তাঁদের পাড়াতে আর্মি আসছে শুনে ছেলেমেয়ে নিয়ে তারা বাড়ির পেছনের নীচু ধানের ক্ষেত্রে মধ্যে আত্মগোপন করেন। অন্তঃসত্ত্ব অবস্থায় সন্তান নিয়ে প্রায় বুকসমান পানিতে দাঁড়িয়ে থাকা ছিল খুবই কষ্টকর। কিন্তু শোনা যাচ্ছিল যে আর্মি বাচ্চাদের দু পা দুদিকে টেনে ছিঁড়ে ফেলে। তাই তাদের জীবন রক্ষার জন্য নিঃশব্দে কয়েক ঘণ্টা ওভাবে কাটাতে হয়।

আশ্রয় নেওয়া

সাঁওতার সুধীর কুমার বিশ্বাস (নাপিত) জানান, যুদ্ধের প্রথম দিকে আর্মি আসার কথা শুনলে অন্য পাড়াতে, কলুদের বাড়ি কিংবা পাটের ক্ষেতে পালাতেন। কিন্তু শেষের দিকে বাড়ির মেয়েছেলে ও বাচ্চাদের সিংদার মকবুল বিশ্বাসের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। এছাড়া কুষ্টিয়া থেকে তাদের স্বজাতীয় ধলু এসে কয়েক দিন তাদের বাড়িতে থাকে।

চর হাজীগঞ্জের মো. আবদুর রশিদের বাড়িতেও মুক্তিযোদ্ধারা আশ্রয় নিয়েছিলেন। তবে ভয়ে বাড়ির মেয়েদের তিনি আট-নয় মাস অন্য আত্মীয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের বাড়ি দুই-এক মাসের জন্য কয়েকজন হিন্দু আশ্রয় নিয়েছিল। পরে তারা ভারতে চলে যায়।

হরিনারায়ণপুরের রাধারমণ পাল বলেন, “সাধারণত মাটেল (ডোবা) ও বোপবাড়ে পালাতাম। কুষ্টিয়াতে বোম্বিংয়ের সময় (১১ বা ১৬ এপ্রিল) নদীর (কালী নদী) ওপারে জঙ্গলীতে বিলাত আলী মোল্লার বাড়িতে আশ্রয় নিই। লক্ষ্মীপুর বাহের মূলের বাড়িতে এক দিন পালিয়ে ছিলাম।”

চর ভদ্রাসনের রহিমা জানান, এলাকায় নিরাপদে চলাফেরা করতে পারতেন। চুরি-ডাকাতির খবর চৌকিদাররা দারোগাকে দিত। তাদের বাড়িতে হিন্দু-মুসলমানদের অনেকেই আশ্রয় নিয়েছিল। আর্মি অনেক হিন্দুকে মেরে ফেলেছিল।

রামদিয়ার শ্রী সত্যজীবন বাগচী জানান, তিনি আর্মি আসার কথা শুনলে পরিবারের সবাইকে নিয়ে ভালুকায় কিতাবউদ্দিন মাস্টার, ফকির মণ্ডল, রোজদার শেখ কিংবা বিরিকয়ায় নজরুল মিয়ার বাড়িতে আশ্রয় নিতেন, পরে ফিরে আসতেন।

নিরাপদে থাকা

নোয়াখালীর নজরপুর গ্রামের মুজিবুল হক কাজ করতেন জুটমিলের ওয়ার্কশপে। তিনি জানান, যুদ্ধের সময় নিরাপদে চলাফেরা করতে পারতেন। গ্রামে পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। রাজাকাররা গ্রামে টহল দিত, যদিও গ্রামে চৌকিদারও ছিল।

চর ভদ্রাসন উপজেলার খবিরুদ্দিন আহমেদ বলেন, “এলাকায় সবাই নিরাপদে চলাচল করত। ডাকাতির সময় চৌকিদার মাঝে মাঝে রক্ষা করত। ২৩ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনী ফরিদপুর শহরে আসার পর ভয়ে অনেকেই শহর ছেড়ে চর ভদ্রাসনে আশ্রয় নেয়। তবে তিন-চার দিন পর হানাদার বাহিনী সবাইকে আশ্বাস দিলে অনেকে নিজের বাড়িতে ফিরে যায়।”

রাজাকার ও আর্মিদের হাত থেকে বাঁচা

শাহ মো. মজিবর রহমানের জবানবন্দি

বৈদ্যনাথপুরের তেলের দোকানি শাহ মো. মজিবর রহমান বলেন, “হারেস মাস্টারের বাড়িতে আগুন দিয়ে আর্মি আমাদের বাড়িতে আসে। এঘর-ওঘর দেখে যখন পাশের বাড়িতে যাচ্ছে, তখন আমিও ওদের পিছে পিছে যাই। এ দেখেই লক্ষ্মীপুরের কুরবান রাজাকার আমাকে ধরে ফেলে ও অস্ত্র ধরে গুলি করতে যায়। তবে অন্য বাড়িতে ঢোকার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই গুলি না করে আমাকে ও মসলেমকে বেঁধে আর্মির হাতে তুলে দেয়।

“আর্মি আমাদের দপের (নীচের) মাঠে নিয়ে যায়। সেখানে আমাদেরকে বলে যে, ‘তোমরা মুক্তি।’ কিন্তু এই সময়ে পিস কমিটির সদস্য মাহতাব মেষ্মার আমাদের দেখে এগিয়ে আসে এবং সুবেদারের মাধ্যমে আমাদেরকে ছাড়িয়ে দেয়।”

শাহ মো. মজিবর রহমান বলেন, “শবে বরাতের দিন আমাদের গ্রামে অভিযান হতে পারে, এ রকম কথা শুনে মাকে রেখে বাড়ির সবাই মিলে ধলনগর ছেট দুলাভাইয়ের বাড়ির উদ্দেশ্যে যেতে থাকি। দেড়িপাড়ায় আসতেই বুটের শব্দে

ক্যানেলের ধার দিয়ে নীচে নেমে যাই। এ সময়ে ওদেরকে আগামের রাস্তা দিয়েই এগিয়ে আসতে দেখে ইজ্জত ফকিরের বাড়ির দেউড়িতে (গেট) বসে পড়ি। এমন সময়ে সে এসে আগামের দেখে বলে, ‘কারা গো? আর্মি এসে পড়েছে, তাড়াতাড়ি ভিতরে আসো।’ পরে ওখান থেকে আরো নিরাপত্তার জন্য দূর সম্পর্কের আলৌয় কোকিল শাহের বাড়িতে গিয়ে রাত কাটাই।”

শাহ মো. মজিবর রহমান আরো বলেন, “দুলাভাইয়ের দুইটা বড় খাসি ছিল, যা রাজাকাররা নিয়ে যাবে এই ভয়ে শবে বরাত উপলক্ষে একটা জবাই করা হয়। নিজেদের জন্য রেখে বাকি গোশত গ্রামের লোকদের দিয়ে দেওয়া হয়। বাড়িতে যা রান্না হয়েছিল তা ওভাবেই ছিল, কেউ খেতে পারিনি। পরদিন সকালে আমি বাড়ি আসি আর সাথের সবাইকে ধলনগর পাঠিয়ে দিই। কিন্তু বাড়ি আসতেই গোলাগুলির শব্দ শুনতে পাই। আমি তাড়াতাড়ি পালিয়ে ধানের ক্ষেতে আত্মগোপন করি। সারা দিন গোলাগুলি হতে থাকে। অল্প বেলা থাকতে বাড়ি আসি। বাড়ির সবাই এক সপ্তাহ পরে ফিরে আসে।” (মুক্তিযোদ্ধাদের আসার কথা শুনে রাজাকাররা গুলি চালায়। পরে আর্মি ও আসে। এখানে যুদ্ধ হয়নি, একতরফা গুলি চলে।)

শাহ মো. মজিবর রহমানের ছোট দুলাভাই ধলনগরের আবুল হোসেন শাহর ভাই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। সেই কারণে বৈশাখ মাসে তাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর থেকে বোন, দুলাভাই, তার দুই ছেলেমেয়ে, তার মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়ের স্ত্রী, দুলাভাইয়ের মা তাঁদের বাড়িতে চলে আসে। একেক সময়ে তাঁরা ধলনগর যেতেন, আবার চলে আসতেন। আর মুক্তিযোদ্ধা ভাইও মাঝে মাঝেই এসে এখানে থাকতেন।

পথে আক্রমণ

হাতিয়ার মো. আলাউদ্দিন শেখ বলেন, “ভারতে গমনরত এক হিন্দু পরিবার দুটি ঘোড়াগাড়িতে আলমডাঙ্গা পৌঁছালে দিঘির মাঠে ৮-১০ জন ব্যক্তি রামদা ও লাঠি নিয়ে আক্রমণ করে। তারা পরিবারের কর্তাটিকে দায়ের নীচে শুইয়ে রেখে লুঠপাট চালায় গাড়িতে। তার মেয়েরা বাবার কাছে যেতে গেলে আমি বলি যে, ‘তোমরা যেয়ো না, বিপদ হবে। তোমরা কিছু না বললে ওরা তোমার বাবাকে ছেড়ে দেবে।’ ডাকাতরা যখন তাকে ছেড়ে দেয়, তখন সে প্রায় পাগল হয়ে গেছে। ছুটে গাড়ির কাছে এসে আমাকে দেখে বলে, ‘দাদা, ভগবান কি সত্যিই আছে?’ আমি লোকটার দিকে চেয়ে থাকি। লোকটা জোরে একবার ‘ভগবান’ বলেই সামনের পথে দৌড় দেয়। পরিবারের প্রতি তখন তার কোনো খেয়াল আর ছিল না।”

নির্যাতন

হাতিয়ার খান মো. আমিনুল হক ওরফে খান সাহেবে জানান, তাঁর ভাই কুষ্টিয়াতে চাকরি করতেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে সরকার অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিত করার চেষ্টা করে। তখন অফিসে গেলে তাঁকে আটকে রেখে মারধর করা হয়। তিনি বলেন, “আমার অন্য দুই ভাই এ খবর পেয়ে কুষ্টিয়া গেলে তাদেরকেও পিটাতে থাকে আর বলে যে, আমরা তিন ভাই প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। অফিসে কুষ্টিয়ার কয়েকজন অবাঙালি এ কথা জানায়। পরে পিস কমিটির কাইযুম উকিল, চন্টু সাহেবদের সহযোগিতায় আমরা ছাড়া পাই।”

গ্রামরক্ষা ও বিপদ

আবু সাইদ প্রিন্সিপালের ছোট ভাই বলেন, “৪০-৫০ জন অস্ত্রধারী রাজাকার আইসে বলছিল আমাগে খাতি দিতি অবে। আমাগে ঘরে ধান-চাল ছিল। না দিয়েও পারি না। অস্ত্র আছে কাছে। যদি কোনো ক্ষতি করে। ভালো ভালো তরিতরকারি দিয়ে খাওয়াইছিলাম।”

কলাবাড়িয়া ইউনিয়ন পিস কমিটির চেয়ারম্যান সৈয়দ হোসেন মোল্লা বলেন, “এলাকার গরিব লোকদের চাল, ডাল, আটা ইত্যাদি বণ্টনের দায়িত্ব ছিল আমার। কাউকে ফিরাতাম না এলাকার।

“মিলিশিয়ারা একবার কলাবাড়িয়ার মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। মিলিশিয়ার কাছে ছিল মাত্র একটা এসএলআর। আমি মিলিশিয়াদের বললাম, মুক্তিফৌজের কাছে অনেক অস্ত্র আছে। তাই আর আক্রমণ করেনি মিলিশিয়ারা, তয় পেয়ে গিয়েছিল।”

ভোমবাগ গ্রামের জমির মোল্লা, মো. নূর-ইসলাম বিশ্বাস ও মকবুল বিশ্বাস জানান, তাঁদের গ্রামের রেজাউল বিশ্বাস ছিলেন পিস কমিটির চেয়ারম্যান। তিনি এলাকার কোনো ক্ষতি করেননি। এলাকার অভাবি লোকজনকে চাল, ডাল, গম, আটা দিয়েছিলেন।

জলিল মোল্লা: জবানবন্দি

পান্টির তখনকার আওয়ামী লীগ নেতা জলিল মোল্লা বলেন, “আমি রামদিয়া মনোয়ারদের বাড়িতে যাই। ওরা আমাকে থাকতে দেয় আর খাবার দেয়। কিন্তু আমার তখন আর খাওয়ার অবস্থা ছিল না। শুধু তাদের দুজনের (জলিল মোল্লার ভাই ও ভাতিজা) কথা মনে হচ্ছিল আর অপরাধবোধ ঘিরে ধরছিল। সন্ধ্যার

দিকে শান্ত হয়ে এলে ওদের বাধা সত্ত্বেও আমি বাড়ি এলাম। ওরা দুজনেই বেঁচে এসেছে। তবে ভাইয়ের অবস্থা খুবই খারাপ। আর্মি তাদের ধরে রাজাকারদের হাতে দেয়। কিন্তু বাজারে রাজাকাররা তখন দোকান লুট করছিল। এদেরকে যারা ধরে রেখেছিল তারাও লুটতরাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই ফাঁকে ওরা পালায়। তবে ধরেই নির্যাতন করায়, বিশেষ করে ভাইকে রাইফেল দিয়ে আঘাত করায় সে অঙ্গান হয়ে যায়। ভাতিজা নিজে মুক্ত হয়ে তাঁকে নিয়ে পালিয়ে আসে।”

জলিল মোল্লা জানান, ওই দিন নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য যখন লোকেরা ছোটাছুটি করে পালাচ্ছিল, তখন তাঁর পরিবারের সদস্যরা প্রথম থেকেই বিভ্রান্ত হয়। একটা অংশ পান্তি থেকে নদী পার হয়ে গোলাবাড়ী রাস্তা ধরে ভালুকা যেতে থাকে। নদীর মধ্য থেকে কিছু লোক বলে যে, সামনেই আর্মি। আবার পেছনে মোহননগরে আগুন দেখা যাচ্ছিল। ফলে এরা লোকদের কথায় কান না দিয়ে সোজা যেতে থাকে। এ দলে জলিল মোল্লার মেয়ে বীথি (৮), ছেলে আনিছ (৬) ছিল।

ওই গ্রন্থটি দ্রুত যাচ্ছিল, প্রত্যেকের কাছেই হয় ছোট বাচ্চা অথবা অন্য জিনিসপত্র, তাই বীথি ও আনিছ কোথায় কীভাবে আসছে, কেউ খেয়াল করেনি। ছোট পায়ে কতটাই বা জোরে যাওয়া যায়। দৌড়ালেও বা কতদূর দৌড়ানো যায়। এক সময় সম্পূর্ণ দলটি তাদের চোখের আড়াল হয়ে যায়। বোনটি একবার ভাইকে কোলে করে, কিন্তু এক পা-ও ফেলতে পারে না, আবার নামিয়ে দিয়ে একটু হাঁটে। দুজনেই একটানা কেঁদে চলেছে। কিন্তু এই মানবশূন্য পথের মধ্যে কেউ তাদের জন্য অপেক্ষায় নেই। মা কোলের বাচ্চা নিয়ে আগের দিনই ওখানে গেছে। শিশু দুটি ছুটে চলছে প্রাণের ভয়ে, তিনি কিলোমিটার দূরে তাদের যেতে হবে। পথও অচেনা। শুধু সামনে চাচাত ভাইবোনদেরকে যেতে দেখেছে।

অবাঙালিদের বিপদ-বুঁকি, আক্রমণ-আশ্রয়

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন অবাঙালি বলেন, “প্রথম প্রতিরোধযুদ্ধে ছোট ওয়্যারলেস ভবনে মিলিটারি অবস্থান করায় আমরা বেশ নিরাপদ ভেবেছিলাম। কিন্তু পরিস্থিতি ঘুরে যায়। আমাদের পাড়াতে রাতে আমি আর আমার বয়সী এক যুবক কী হচ্ছে খোঁজ নেওয়ার জন্য ঘুরছিলাম (টহল বা পাহারা বলা যায় না, কারণ আমাদের অস্ত্র ছিল না)। রাত ১২টার কিছু পর মজিদ খান (মজিদ বিহারি) আটজন আর্মিকে নিয়ে খুব গোপনে এখান থেকে বের হয়ে কুষ্টিয়া পুলিশ লাইনে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু আর্মিরা সেখানে নিহত হয়, মজিদ কোনোরকমে জীবন বাঁচায়। এ খবরে আমাদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয় এবং আশপাশের উঁচু ও মোটা দেওয়ালওয়ালা বাড়িতে আশ্রয় নিতে থাকি।

“আমি সামসুন্দিন সাহেবের বাড়িতে আশ্রয় নিই (তাঁর বাড়িকে ‘রেডিও পাকিস্তানের বাড়ি’ বলে চিনত, কারণ তাঁর দোকানের নাম ছিল ‘রেডিও পাকিস্তান’)। কিন্তু ইপিআর কুষ্টিয়া দখল করলে আবারও জীবনের ভয় চলে আসে। তারা বাড়ির মালিক সামসুন্দিন মিয়া, জামাল, মনির পুলিশ, মজমপুর ইউনিয়নের নবী চেয়ারম্যানসহ আমাদের পাড়াতে ১২ জনকে হত্যা করে। আমাদের বাড়ির সবাই পাশের বাঙালি জেহের মণ্ডলের বাড়িতে আশ্রয় নিই। আমি গোয়ালের ভিতরে চালের সাথে আটকে থাকি। আমার আম্মা ও ভাইয়ের বৌরা মণ্ডলের চাতালে ধানের কাজ করতে থাকে। ইপিআর এলে মণ্ডল বলে, ‘এরা আমার চাতালের লোক।’ ফলে আমরা সেবার রক্ষা পাই।”

তিনি আরো জানান, এ সময়ে তাদের অবাঙালি পাড়ার মাত্র কয়েকটি পরিবার এভাবে পাশের বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিল। আর সব অবাঙালি বাচ্চা-কাচ্চা-বউ-বিদের নিয়ে জীবন বাঁচাতে কুষ্টিয়া জেলখানায় আশ্রয় নেয়। কিন্তু ইপিআর কুষ্টিয়া দখল করে জেলখানায়ও হামলা চালায় এবং নির্বিচারে গুলি করতে থাকে। জেল পুলিশরা মারা যায়। আর ভেতরের নারী-পুরুষরা ছোটাছুটি করতে থাকে। ওরা জেলের প্রাচীরের বিভিন্ন খাঁজে খাঁজে পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ইপিআর যখন জেলগেট ভেঙে ভেতরে ঢুকতে থাকে তখন প্রত্যেকেই মৃত্যু নিশ্চিত জেনে চিন্কার করে কাঁদতে থাকে। এ সময়ে আজগরের নেতৃত্বে কয়েকজন অবাঙালি যুবক মৃত পুলিশদের অস্ত্র নিয়ে গুলি করতে থাকে।

ওই ব্যক্তি জানান, হঠাৎ প্রতি-আক্রমণে ইপিআরের সামনের কয়েকজন মারা যায়। আর অবাঙালিরা তাদের অস্ত্র নিয়ে আরো গুলি করতে থাকে। কোনো কোনো অবাঙালির কাছে ব্যক্তিগত অস্ত্রও ছিল। কিছু সময় পরে ইপিআর চলে যায়। অবাঙালিদের কয়েকজন মারা গেলেও বেশির ভাগই জেল থেকে বেরিয়ে আসে। পরে তাদের অধিকাংশই ঈশ্বরদীর দিকে চলে যায়। অন্যেরা পরিচিতদের বাড়িতে আত্মগোপন করে। আর্মি এসে কুষ্টিয়া পুনর্দখলের পরে অবাঙালিদের ওপর এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে কুষ্টিয়া বোর্ডিংয়ের সামনে থেকে মেঠরপাড়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ পুড়িয়ে দেয়। বাঙালি সরফুন্দিন ঠিকাদার ও অবাঙালি লাহোরিদের পরিবার আর্মি ও মুক্তিযোদ্ধাদের হামলা থেকে রক্ষা পেতে একে অন্যের বাড়িতে আশ্রয় নিত।

মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকার

কুষ্টিয়ার এক ব্যক্তি বলেন, “আমার ছেলে মোহসিন আলী সত্যিই মুক্তিযোদ্ধা হয়েছিল এবং ভারতে গিয়েছিল। সে দেশে ফিরে চাচার বাসায় ওঠে এবং দিনের

বেলায় থানায় গিয়ে দারোগার সঙ্গে দেখা করে আসে। আমার ওপর যে কোনো সময় বিপদ হতে পারে ভেবেই সে এটা করে। মজিদ সাহেব কুষ্টিয়াতে দারোগার কাছে সংবাদ পাঠিয়ে ওই নির্দিষ্ট বাসাতে আমার ছেলে আছে কি না-তা জানতে চায়। দারোগা জানায়, সে আজই তার সাথে দেখা করেছে। ফলে আবার দুইজন রাজাকার আমাকে বাড়ি পৌছে দিতে বলে।

“আমার ভাগ্নে বাবু মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ছিল এবং প্রায়ই দল নিয়ে আমার বাড়িতে সন্ধ্যার পরে এসে খেয়ে যেত। তবে আমার বাড়িতে থাকত না কখনো। এভাবে আমাকে বারবার আর্মি-বিহারিরা ডেকে নিয়ে যেত। আর প্রতিবারই যাওয়ার সময় মনে হতো এই শেষ যাওয়া। আমার ফিরতে দেরি দেখলে গ্রামের পুরুষ-মহিলারা সেই আর্মি-বিহারিদের ক্যাম্পে যেত। তবে বলতে হয় যে, দুই নৌকায় পা দিয়ে আমি সত্যিই জীবনের বুঁকি নিয়েছিলাম।”

সলিম বিশ্বাস: মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও শহীদের বাবা

উজানগ্রাম ইউনিয়নের চেয়ারম্যান দুর্বাচারার সলিম বিশ্বাস। বিশেষ ধনী ব্যক্তি, দুই স্ত্রী, ৮ ছেলে ও ৮ মেয়ে। তিনি যুদ্ধের শুরু থেকেই মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেন এবং সাহায্য-সহযোগিতা দিতে থাকেন। এতে করে অচিরেই তিনি পাকবাহিনীর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন এবং পালিয়ে বেড়াতে শুরু করেন। তাঁর এত বড় পরিবারটিও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে। ছেলেরা ভারতে ট্রেনিং নিতে যায়। শুধু তিনিই নন, তাঁর পরিবারের সবাই, এমনকি আত্মীয়স্বজনও তাঁর কারণে পালিয়ে বেড়াতে থাকে এবং নানা হয়রানির শিকার হয়। যেমন, তার স্ত্রীর বড় ভাইকে শুধু তাঁর কারণেই তিনি বার আর্মি-ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়।

তার ও পরিবারের জীবন রক্ষায় এলাকাতে কৌশলে রটিয়ে দেওয়া হয় যে, ভারতে যাওয়ার পথে সলিম বিশ্বাস ছেলেমেয়ে নিয়ে নদীতে ডুবে মারা গেছেন। প্রতিটি উৎস থেকে একই কথা শোনার পর আর্মি তাঁর সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এতে তিনি বেশ নিরাপদেই মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায়, রাতুলপাড়াতে হুর আলীর নিকট থেকে সলিম বিশ্বাস প্রদত্ত ১টি রাইফেল ও ৫০ রাউন্ড গুলি আর্মি উদ্ধার করতে সমর্থ হয়।

ছোটখাটো ও কৃশকায় সলিম বিশ্বাস কতটা আত্মপ্রত্যয়ী ছিলেন তা বোঝা যায় একটি ঘটনায়। ধলনগর করিমপুরে পাকসৈন্যদের সঙ্গে সমুখ্যযুদ্ধে তাঁর বড় ছেলে শহীদুল ইসলাম বাবু শহীদ হন এবং অপর ছেলে সাবু রাজাকারদের হাতে ধরা পড়েন। বাবুকে যখন দাফনের জন্য দুর্বাচারাতে নিয়ে আসা হয়, তখন তাঁর বাবা পালিয়ে ছিলেন রাতুলপাড়াতে। ওখান থেকে বাবুর মামা এদ্বার বিশ্বাস

খাটিয়ায় করে দুর্বল ও ভগ্নস্বাস্থ্যের সলিম বিশ্বাসকে নিয়ে যান শেষবারের মতো সন্তানকে দেখাবার জন্য। তবে হার্টফেল করতে পারেন ভেবে প্রথমে না বলে ধীরে ধীরে তাঁকে বলার চেষ্টা করা হয়।

এদ্বার বিশ্বাসের ভাষায়, “যখন আমরা দুর্বাচারার কাছাকাছি তখন আমি বললাম, ‘ভাইজান, বাবু তো আজ চলে যাচ্ছে (আমি কান্না ধরে রাখতে পারছিলাম না), শেষ দেখার জন্য নিয়ে যাচ্ছি।’ আশ্চর্য যে তিনি অসুস্থ শরীরে খাটিয়ার উপর উঠে বসে বললেন, ‘ওহ, বাবু চলে যাচ্ছে, তাই তোমরা আমাকে নিয়ে আসছো। ও তো যাবেই, ওর যে যাবার সময় হয়ে গেছে।’ সাবু যে ধরা পড়েছে তা তখনো তাঁকে বলিনি। এ অবস্থায়ও তাঁর যে মনের জোর, তা সত্যিই বিস্ময়কর।”

নিরাপত্তাহীনতার কারণে পান্তি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ('৭১-পূর্ববর্তী) মহিউদ্দিন মোল্লা সপরিবারে শৈলকুপা থানার কাতলাগাড়ীতে শুশ্রবাঢ়ি চলে যান। আর তৎকালীন সভাপতি মাওলানা তোফাজেল হোসেন সমগ্র যুদ্ধের সময় কোথাও স্থির থাকেননি। এক দিন পান্তি থাকলে আরেক দিন পাশের গ্রামে কিংবা অন্য দিন নতুন কোনো জায়গায়।

জলিল মোল্লা: আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক বিপদ

আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি আবদুল জলিল মোল্লা বাড়ি ছেড়ে তেমন কোথাও যাননি। তবে রাতে তিনি গ্রামে আখ কিংবা পাটের ক্ষেতে অথবা নিজের বা পাশের গ্রামে এমন একজনের বাড়িতে আশ্রয় নিতেন যাকে কেউ সন্দেহ করত না। কিন্তু এরপরও জলিল মোলার নিষ্ঠার হয়নি।

শান্তি কমিটি গঠনের পর তারা জলিল মোল্লাদের সম্পর্কে পাকিস্তানি আর্মির কাছে রিপোর্ট করে ও পান্তিতে প্রথম সেনাবাহিনী নিয়ে যায়। নেতাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়, তাঁরা সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে যেন দেখা করেন। কয়েক দিন পালিয়ে থাকার পর মাওলানা তোফাজেল হোসেন ও আবদুল জলিল মোল্লা পরিচিত শান্তি কমিটির এক সদস্যের মাধ্যমে ক্যাম্পে হাজির হন।

সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন, “আপনারা নৌকায় ভোট দিয়েছেন? আপনারা মুজিবের দল করেন?” দুজনেই একবাক্যে স্বীকার করেন, তাঁরা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, নৌকাতে ভোট দিয়েছেন। পরবর্তী প্রশ্ন ছিল, “আপনারা কি জানেন মুজিব দেশকে ভারতের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে?” মাওলানা উত্তেজিত হয়ে উঠলেও আবদুল জলিল মোল্লা বিনীতভাবে বলেন, “আমরা ছয় দফার জন্য ভোট দিয়েছি। এতে পূর্ব পাকিস্তানের কিছু স্বার্থ ছিল। কিন্তু দেশ বিক্রি করার জন্য আমরা নৌকায় ভোট দিইনি। আর এ রকম

কিছু হলে আমরা মুজিবকে সমর্থন করব না।” সে তখন বলে, “তাহলে আপনারা তওবা করেন।” সে মুহূর্তে দুজন তওবা করে ফিরে আসেন।

পরবর্তীকালে যুদ্ধের তীব্রতায় পান্টিসহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় রাজাকারণ তাদের ক্যাম্প গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। তেমনি এক সময়ে পান্টি ইউনিয়ন পরিষদ ও শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান খিলাফাত উদ্দিন পুনরায় এদের তলব করেন। কিন্তু দেখা যায়, মাওলানাকে যেদিন বাড়িতে পাওয়া যায় সেদিন সাধারণ সম্পাদক নেই। কিংবা তিনি থাকলেও মাওলানা নেই। তারা অবশ্য নিশ্চিত ছিলেন, এবারে তাদের মেরে ফেলা হবে।

তাদের দুজনকে একত্রে পরামর্শ করে একই সঙ্গে যাওয়ার জন্য রাজাকার ও পিস কমিটির স্থানীয় সদস্যরা অনুরোধ করে। কিন্তু কয়েক দিন অতিক্রান্ত হওয়ায় মাওলানাকে না পেয়ে নিরূপায় হয়ে আবদুল জলিল মোল্লা পিস কমিটির সদস্য মোজাম্বেল হক জোয়ার্দারের সঙ্গে উপস্থিত হন।

পান্টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে বিহারি নেতা মজিদ খানের সামনে তার বিচার অনুষ্ঠিত হয়। ওই বিকেলে বিচার দেখতে পান্টি বাজারের অধিকাংশ লোক মাঠে উপস্থিত হয়। সেখানে খিলাফাত উদ্দিন একে একে সেই বিহারির কাছে অভিযোগগুলো পেশ করতে থাকেন।

ওই বৈঠকে জলিল মোল্লা সম্পর্কে খিলাফাত উদ্দিন বলেছিলেন, ওই ব্যক্তি কুমারখালীর দক্ষিণাঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচালনা করে, তার নির্দেশেই অনেককে হত্যা করা হয়। তার নেতৃত্বে পান্টির রাজাকার ক্যাম্পে তুমকি দেওয়া হয় ও ক্যাম্প গুটিয়ে যায়। সর্বোপরি সে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তার কাছে তওবা করে আবার সেই কাজ করেছে। এত কিছুর পর তাকে আর বাঁচিয়ে রাখা উচিত হবে না।

এরপরে জলিল মোল্লার মৃত্যুর আদেশ দিতে প্রস্তুত হন মজিদ বিহারি। এই পর্যায়ে বিচার দেখতে আসা শান্তি কমিটির পরিচিত সদস্য, রাজাকার, পান্টি ও আশপাশের গ্রামের মুরগিবিরা এই মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করেন। শেষে তারা মজিদ বিহারির কাছ থেকে আবদুল জলিল মোল্লাকে মুক্ত করেন।

হিন্দুদের পালানো

কালিদাসপুরে হিন্দু জনগোষ্ঠী ছিল, যাদের বেশির ভাগ ছিল মুচি বা অন্য সম্প্রদায়ের। যুদ্ধের সময় তারা ভারতে চলে যায়। তাদের রেখে যাওয়া মালামাল লুট হয়। তবে মিরপুরের সুখচান বলেন, “গ্রামে মিলিটারির ভয় থাকলেও আমি নিরাপদে চলাফেরা করতাম।” অবশ্য এটা ছিল বিচ্ছিন্ন ঘটনা।

ফরিদপুরের মধুখালী উপজেলার ভূমাইন গ্রামের নিতাই চন্দ্র মণ্ডল ভারতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত গ্রামে নির্বিষ্ণে চলাফেরা করেছেন। তিনি বলেন, “আর্মি কামারখালীতে ঘাঁটি করার পর পরিবার নিয়ে ভারতে যাই। বাড়িঘর, জমিজমা, দলিল, আসবাবপত্র সবকিছু গ্রামে রেখে যেতে হয়। ছয়-সাত মাস পর গ্রামে ফিরে দেখি জমি ঠিকঠাক থাকলেও, বাড়িঘর ঠিক নাই।” নিতাই জানান, তারা ভারতে যাওয়ার পর গ্রামে মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়। গ্রামের চৌকিদাররা চেয়ারম্যানের সঙ্গেই থাকত।

এই গ্রামের কৃষক রওশন আলী খান জানান, গ্রামে আর্মি আসার পর হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানরাও এলাকা ছাড়তে থাকে। গ্রামে থাকা অন্য বাসিন্দারা খুবই সাবধানে ও ভয়ে ভয়ে থেকেছে।

সাঁওতার শ্রীমতী শেফালী রানী বলেন, “আর্মি আসার কথা শুনে আমরা দৌড়ে কলুপাড়াতে যাই। কিন্তু জবাব কলুর বৌ আমরা হিন্দু বলে কিছুতেই ঘরে উঠতে দেয়নি। বলে যে, হিন্দু দেখলে আমাদেরও বিপদ হবে।”

ফরিদপুরের শ্রীপুরের যতীন্দ্রনাথ মণ্ডল বলেন, “আর্মি আসার কথা শুনলে আমরা হিন্দুপাড়া থেকে সবাই পাশের রামদে (রামদিয়া) বা ভোড়োপাড়াতে (ভুড়য়াপাড়া) মুসলমান বাড়িতে গিয়ে থাকতাম। ছেলেমেয়ে সবাই এ রকম করতাম।”

হিন্দুদের বিপদ

বাগবাড়িয়াতে যেদিন হিন্দুবাড়ি পোড়ায়, সেদিন সুধীর, অমূল্য, জ্ঞানেন, মনোরঞ্জন, তারাপদ ও আদ্যনাথ মণ্ডলকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় পান্টি ক্যাম্পে। এদের অপরাধ কারো বাড়িতে গুলির খালি খোল, কারো বাড়িতে ভারতীয় দু-একটা ঝুঁপি বা মুদ্রা পাওয়া গেছে। এদেরকে বোর্ড অফিসের আমগাছে বেঁধে মারতে থাকে। একই দিন তোফাজ্জেল মৌলভী ও আবদুল জলিল মোল্লাকে নিয়ে এসে তওবা করায় পাকিস্তানি আর্মিরা। তাদের দেখেই হিন্দুরা হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে।

ওই সময় রাজাকাররা বোঝান যে, “এই সব হিন্দু পাকিস্তানকে ভালোবাসে বলেই ভারতে যায়নি। শত অত্যাচারেও দেশে রয়েছে। এ ছাড়া এরা সমাজের অনেক ছোটখাটো কাজ করে। এদেরকে ছেড়ে দিতে হবে।” এই কথা শুনে সেখানে থাকা আর্মি অফিসারটি সম্মত হয়। তবে তিনি বলেন, ধলনগরের ঘাটে নিয়ে গিয়ে ওদের ছেড়ে দেওয়া হবে। তখন নেতৃবৃন্দ উপলক্ষ্মি করেন যে নদীর চরে নিয়ে প্রত্যেককে মেরে ফেলবে। আর্মি রওনা হতেই তারা করিমপুরের শাস্তি কমিটির চেয়ারম্যান আফতাব মুসীর কাছে গ্রামেরই ঘরজামাই তার ছেলে সরোয়ার মুসীকে পাঠায়। সে যেন নদীর এপারে দাঁড়িয়ে থাকে ও তাদের ছাড়িয়ে দেয়। কথামতো এই ছয়জন হিন্দুর প্রাণ রক্ষা পায়।

আশ্রয় নেওয়া

সাঁওতার সুধীর বিশ্বাস (৭০) বলেন, “বিহারি নিয়ে (কৃষ্ণিয়া থেকে) রাজাকাররা যখন আমাদের গ্রামে আসে, তখন গ্রামেরই অপর পাড়ায় কলুদের বাড়ির আশপাশের পাটক্ষেতে পালাই। যে যেদিকে সুযোগ পায় সেদিকেই পালাতে থাকে। বাড়ির মেয়েছেলেরা কোথায় যাচ্ছে তারও খোঁজ নেওয়ার অবসর নেই। আমার মেয়েটাকে (৬-৭ বছর) গ্রামের জলিলের বাড়িতে ওর মা পাঠিয়ে দেয়। রাজাকাররা জলিলের বাড়িতেও হিন্দুরা পালিয়েছে কি না দেখতে যায়। কিন্তু জলিলের স্ত্রী বলে, ‘এখানে কোনো হিন্দু নেই।’ সবকিছু দেখে রাজাকাররা ফিরে চলে যাচ্ছিল, তখন মেয়েটা ‘পিসিমা’ বলে মাটিতে বসে থাকা জলিলের স্ত্রীকে বসার জন্য পিঁড়িটা এগিয়ে দেয়। এতে একজন রাজাকার ‘হিন্দু রেখেছিস’ বলে হাতের রাইফেল দিয়ে আঘাত করলে ওই মহিলাটি অঙ্গান হয়ে যায়। কিন্তু ততক্ষণে অন্য রাজাকাররা চলে যাওয়ায় ওই রাজাকারটিও চলে যায়।”

দৌলতপুরের সিলিমপুর গ্রামের বাসিন্দা আমেনা খাতুনের বাসায় হিন্দু-মুসলমান অনেকেই আশ্রয় নিয়েছিল, যাদের বেশির ভাগ ভারতে পালিয়ে যাচ্ছিল। এদের অনেকেই বাবা-মাকে ডালিতে করে নিয়ে যাচ্ছিল। এভাবে তারা পানি পার হয়ে কষ্ট করে ভারতে যেত। তিনি বলেন, “তখন খাওয়ার অভাব ছিল। অনেকেই অনাহারে থাকতেন।”

তবে সব এলাকার মানুষ বিপদে ছিলেন না। যেমন নোয়াখালীর একজন জানান, এলাকা নিরাপদ ছিল, বাড়ি ছাড়ার কোনো প্রয়োজন হ্যানি। বরং তাদের বাড়িতেই আত্মীয়রা আশ্রয় নিতে আসে। অর্থাৎ ভয় পেলে মানুষ নিরাপদ জায়গায় পালিয়ে যেত।

নজরপুর গ্রামের ফজলুল করিম সরকারি স্বাস্থ্য পরিদর্শক ছিলেন। তিনি জানান, তাঁদের গ্রামে চৌকিদারের পাহারা থাকায় সেখানে মানুষ নিরাপদ ছিল। তাই পাশের সোনাপুর থেকে অনেকেই সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল।

আইয়ুবপুরের কৃষক সুলতান আহমেদ জানান, তিনি ভয়ে কখনো কখনো অন্য গ্রামে গিয়ে রাতে আশ্রয় নিতেন।

ঘোষবাগ গ্রামের কৃষক শচীন্দ্র কুমার সাহা যুদ্ধের সময় নিজ এলাকাতে ছিলেন। তাঁর বাড়িতে আগুন দিলে তিনি স্থানীয় সম্ভান্ত এক ব্যক্তির (চৌধুরী) বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সোনাইমুড়ির নায়েবের বাড়িতেও কয়েকজন আশ্রয় নিয়েছিল।

ঘোষবাগ গ্রামের শিক্ষক সুনীল চন্দন সাহা ভয়ে সোনাইমুড়িতে পিসির বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেন। পরে তিনি ভারতে চলে যান।



নোয়াখালীর জোবেদা জানান, তাদের গ্রামে বাইরের লোক আশ্রয় নিতে আসে। যেমন, ঘর পুড়ে যাওয়ার জন্য সোনাইমুড়ি ও মাইজদী থেকে পাশের বাড়িতে আশ্রয় নিতে আসে। দুই-তিন মাস এই গ্রামে ছিল তারা।

ঘোষবাগ গ্রামের অমল চন্দ্র বাহা যুদ্ধের সময় গ্রামেই ছিলেন। তবে তাঁর ভাই রাজাকারদের ভয়ে ভারতে চলে যায়। সোনাইমুড়ি থেকে তিন-চারটি পরিবার এসে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। তারা গ্রামে ৪০-৪২ দিন ছিল।

চর হাজীগঞ্জের আবুল কালাম বিশ্বাস বলেন, “গ্রামে মুক্তিবাহিনী ঘোরাফেরা করত। শহরের আত্মীয়-অনাত্মীয়রাও গ্রামে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। তাঁদের কারণে কোনো সমস্যা হয়নি।”

মো. ইমান উদ্দিন মোল্লা জানান, তাদের বাড়িতে হিন্দুরা ও শহর থেকে অনেকেই এসে দুই-তিন মাস ছিল। তাদের জমিতে অনেক ধান হওয়ায় আশ্রিতদের খাওয়া নিয়ে তেমন কোনো সমস্যা হয়নি।

নগরকয়ার মোছা. রেনুকা খাতুন বলেন, “আমার ননদাইকে রাজাকাররা মেরে ফেলতে গেলে গাঢ়গঞ্জ থেকে ননদ-ননদাই ও তাদের তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে আমাদের বাড়ি আসে। ওরা আমাদের বাড়িতে ৩ মাস ছিল।”

বিরিকয়ার শেখ আফসার উদ্দিন বলেন, “আমরা বড় কিছু শুনলে শেখপাড়া মামুন খার বাড়িতে কিংবা নাতুড়ি (নাতুড়িয়া) পালাতাম। সন্ধ্যা হলে ফিরে আসতাম। বাড়িতে শুধু মা থাকত, আমাদের বাড়িতে কৃষিয়ার বিউগলার ও জেল জমাদার নিজ নিজ পরিবারসহ আশ্রয় নিয়েছিল (তিন মাস)। ওরা আলাদা রান্না করে খেত।”

পান্টির মহাদেব চন্দ্র মণ্ডল (হাজারী মণ্ডল) বলেন, “আমি যুদ্ধের মধ্যে আমার বাড়ির বেশির ভাগ লোককে বিভিন্ন জলিল কারিকরের বাড়িতে পাঠিয়েছিলাম। তারা আমাদের জন্য একটা গোয়াল ঘর ছেড়ে দিয়েছিল। যেদিন কিছু জোগাড় করতে পারতাম সেদিন ঠিকমতো রান্না হতো। তা না হলে বিভিন্ন বাড়ি থেকে চেয়ে নিয়ে (চাল, খুদ, গম বা অন্য কিছু) রান্না করে খাতাম (খেয়েছি)। একেবারে না খেয়ে থাকতে দেখলে জলিল কারিকরের বউ কোনো কিছু পাঠায়ে দিত। আর আমি তোফাজেল মৌলভির বাড়ি দু-চার দিন, ইত্রাহিম বিশ্বাসের বাড়িতে কোনোদিন এভাবে থাকতাম।”

পান্টির মো. আবদুল জলিল মোল্লা জানান, তিনি মোহননগরে এক বাড়িতে ও পান্টিতে এক বাড়িতে মাঝে মাঝে রাতে থাকতেন। তবে বেশির ভাগ রাতেই আখন্দেতে কাটাতেন। তিনি আরো জানান, তাদের বাড়িতে কৃষিয়ার সিঅ্যান্ডবি ইঞ্জিনিয়ার সুজাত আলী ভূইয়া (কুমিল্লা) যুদ্ধের পুরো নয় মাসই ছিলেন। তাঁর স্ত্রী

ও এক সন্তানও ছিল। তারা পৃথক রান্না করে খেতেন। তবে তরকারি আদান-প্রদান হতো।

রামনগরের বিমল কৃষ্ণ পোদ্দার জানান, আর্মি এলে তাঁরা পাশের বিড়িপাড়া কিংবা ধর্মপাড়া গ্রামে চলে যেতেন। চাপড়া ইউনিয়নের ধর্মপাড়া গ্রামের কামাঙ্ক্য অধিকারী জানান, যেদিন ইউনিয়নে শান্তি কমিটি গঠিত হয়, সেদিনই দুপুরের পরে সেনাবাহিনী, বিহারিরা ভাঁড়রা গ্রাম ও আশপাশে অভিযান চালায়। তারা রণজিৎ ঘোষকে পুড়িয়ে হত্যা করে। ধর্মপাড়ার সব লোক পালিয়ে গড়াই নদীর চরে আশ্রয় নেয়। সন্ধ্যার দিকে ফিরে এসে সেই রাতেই হিন্দু অধ্যুষিত ওই গ্রামের অধিকাংশ লোক ভারতের উদ্দেশে রওনা দেয়। এটা ছিল জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম দিন।

বাঁচার কৌশল

বুনি রানী (ডোম) জানান, তার ভাই মানিকগঞ্জে এক মুসলমানের বাড়িতে ছিল। সেখানে বিহারিরা তাকে ধরলে সে নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়। তখন তাকে নামাজ পড়তে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৪-১৫ বছরের ওই কিশোর দেখে, ওদের সঙ্গে থাকা নিরাপদ নয়, কারণ যে কোনো সময় কাপড় খুলে দেখতে পারে। তাছাড়া নামাজও ঠিকমতো জানা নেই। তাই দুই-তিন দিনের মধ্যেই সে পালিয়ে চলে আসে।

সত্যজীবন বাগচী ওরফে শম্ভু ঠাকুর বলেন, “বাড়ি (রামদিয়া) থেকে বাজারে (পান্তি) যাচ্ছিলাম। পথে দেখি আর্মি, যে যাচ্ছে তাকেই ধরে হিন্দু না মুসলমান এ রকম অনেক প্রশংসন জিজ্ঞাসা করছে। আমাকে দাঁড়াতে বললেও আমি শুনিনি, এমন ভাব করে যাচ্ছিলাম। ওরা আমার প্রতি বিরক্ত হয়। কিন্তু ওই সময়ে রাজাকার কমান্ডার কুতুবের মা আমাকে ওদের বাড়ি নিয়ে যায়। তারপর আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়। ওই দিন এভাবেই বাঁচি।”

হরিনারায়ণপুরের রাধারমণ পাল (৮২) বলেন, “আর্মি আসার কথা শুনলেই আমরা আশপাশের ডোবা, ঝোপঝাড়ে ও কুষ্টিয়াতে বোম্বিংয়ের সময় কালী নদীর ওপারে জঙ্গলী গ্রামের বিলাত আলী মোল্লার বাড়িতে আশ্রয় নিই। এছাড়া অন্য একদিন লক্ষ্মীপুর বাহের মণ্ডলের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করি।”

হাতিয়ার মো. শাহাদাত হোসেন ছিলেন ঢাকা মিনাপাড়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তিনি বলেন, “প্রচণ্ড কাদার জন্য বৃষ্টিকালে এ গ্রামে কেউ যেতে পারত না। এমনি এক সময়ে (আশ্বিন মাসে) কিছু মুক্তিযোদ্ধা আমাদের স্কুলসহ আশপাশে অবস্থান নেয়। ওরা খুব গোপনে ট্রেন লাইনে মাইন পুঁতে রাখে। আমরা আতঙ্কিত হয়ে বলি, ‘স্কুল তো থাকবেই না, আর্মি গ্রামটিও ধ্বংস করে

ফেলবে।' কিন্তু ওরা অভয় দিয়ে বলে 'কিছুই হবে না।' আমরাও ওদের সঙ্গেই পালিয়ে থাকি। সকাল ৯টার মেল ট্রেন আসতেই তিনটি বগি উড়ে যায়। গ্রামের লোকজন পালাতে থাকে। আধিঘটার মধ্যেই কুষ্টিয়া থেকে আর্মি চলে আসে। আমরা পাশের কলাবাড়িয়াতে পালাই।

"আর্মি এসে ঢাকা মিনাপাড়া ও ঝালুপাড়াতে অভিযান করে। প্রতি গ্রামেই বেশ কিছু বাড়ি পোড়ায়। আমি যে বাড়িতে লজিং থাকতাম, সে বাড়ি ভাঙচুর করে, ধান-চাল ছিটিয়ে ফেলে। অর্থাৎ সবকিছু তচ্ছনছ করে দেয়। তবে ওদের বাড়িটা পোড়ায়নি। আমাদের কুষ্টিয়া যেতে পথে চৌড়হাসে চেক করত। আমার ডিপার্টমেন্ট থেকে আইডেন্টিটি কার্ড দিয়েছিল। তাই আমার কখনো অসুবিধা হয়নি।"

তিনি আরও জানান, যে বাড়িতে লজিং থাকতেন সে বাড়ির নাতিজামাই (যাঁর বাড়ি ঝাউদিয়া) আলমডাঙ্গা টেলিফোন এক্সচেঞ্জে চাকরি করতেন। সরকারের চাপে রাতে ডিউটি করতে গেলে মুক্তিযোদ্ধারা তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। তবে তিনি সাধারণ চাকরিজীবী ছিলেন, পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন না।

মহেন্দ্রপুরের হৃমত আলী মোল্লা বলেন, "আমার বাড়ি একেবারে পদ্মার চরের সঙ্গে আর বাড়ির চারপাশে পানি। রাজাকার ও আর্মি আসবে না এ চিন্তা করে বাহার কমান্ডারের নেতৃত্বে ১০ জন মুক্তিযোদ্ধা তিন মাস আমার বাড়িতে থাকে। ওরা সারা দিন শুয়ে থাকত আর সন্ধ্যার পরে খেয়েদেয়ে পানির মধ্য দিয়ে কীভাবে যেন নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ত। শেষের দিকে এক রাজাকার (পাথরবাড়িয়ার ইয়াদ আলী প্রামাণিকের ছেলে) মিলিশিয়াদের এ সংবাদ জানিয়ে দেয়।

"যেদিন আমাদের এলাকায় মিলিশিয়া আসে সেদিন সবাই পালালেও স্থানীয় রাজাকাররা বলে, 'মাঠে যারা কাজ করে ওরা তাদের কিছু বলে না।' তাই আমি, আমার ছোট ভাই আর কাজের লোক মাঠের দিকে যেতেই ওরা আমাদের ধরে ফেলে। ধরেই প্রচণ্ডভাবে মারতে থাকে। 'শালা মুক্তিকো খিলাও' বলে আর মারে। আমার কপাল কেটে রক্ত বের হতে থাকে। অন্যদেরও বিভিন্ন জায়গা কেটে যায়। এরপর আমাকে ঘোড়ার পেছনে বাঁধতে যায়। কিন্তু আমাদের বাড়ির সবাই কাল্পাকাটি করতে থাকে। আমার মা ওদের যে কোনো দাবি পূরণ করার অঙ্গীকার করে। অবশ্যে সাড়ে তিন হাজার টাকার বিনিময়ে আমাদেরকে ছেড়ে দেয়। তবে আমাদের কাছে দুই হাজার ৭০০ টাকা ছিল, আর ৮০০ টাকা অন্যের কাছ থেকে নিয়ে দেওয়া হয়।"

মিরপুরের নওদাপাড়া গ্রামের জাহানারা বেগম জানান, মিরপুরে বিভিন্ন জনের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিলে তিনি ভয়ে কোলের সন্তানকে নিয়ে পাশের

কঁঠালবাগানে লুকিয়ে ছিলেন। আর কখনো বাড়ি ছেড়ে কোথাও পালাননি। যুদ্ধের সময় তাঁর পরিবারের কেউ মারা যাননি। নারীরা গর্ত খুঁড়ে লুকিয়ে ছিল।

নোয়াখালীর উম্মে কুলসুমের স্বামী-শ্শুরকে হত্যা করা হয়। ওই দিনই তিনি আশ্রয়ের জন্য সন্তানদের নিয়ে হাজিরিগিরিতে চলে যান। পরে ফেরত আসেন। কুলসুম জানান, বাড়িতে আত্মীয়রা এলে খাওয়া-থাকার কিছুটা কষ্ট ছিল। তবে ‘মিলে-ঝুলে’ থাকতে হয়েছে।

কুমারখালীতে হত্যা

পাকিস্তানি ও তাদের সহযোগীরা কুমারখালী থেকে পাশের সদকী ইউনিয়নে বিভিন্ন সময়ে অনেককে হত্যা করে। হাসিমপুর থেকে ধরে নিয়ে মুজাহিদ ক্যাম্পে কিংবা পান্টি অভিযানে আশপাশের গ্রাম (আসা ও যাওয়ার পথে) মোহননগর, পান্টি বাজারে আসা সাতজন ও গণেশপুরের দুইজন, রামচন্দ্রপুরে একজন ও নিয়ামতবাড়িয়াতে একজন হাফেজকে হত্যা করে (নভেম্বর মাসে)। তারা শুধু কুমারখালীর বিভিন্ন অঞ্চলে নিহত হন। তাদের মধ্যে অবস্থাপন্ন লোক, শিল্পমালিক থেকে মুচি, সাধারণ কৃষক, কামলা, কসাই, মওলানা বা ধর্মীয় নেতাও রয়েছেন। এদের কেউই মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন না। শুধু অভিযানকালে সামনে পড়ে যাওয়াতে কিংবা পলায়নরত অবস্থায় অথবা জীবনের ভয়ে মাঠে পালিয়ে থাকা অবস্থায় তারা নিহত হন।

কুষ্টিয়ার এক ব্যক্তি বলেন, “আরেক দিন দুইজন রাজাকার এসে আমাকে সঙ্গে নিয়ে বিভিপাড়া ক্যাম্পে যায়। এখানে আবদুল মজিদ খান ওরফে মজিদ কসাই ছিল প্রধান ব্যক্তি। সে খুব ভয়ঙ্কর লোক ছিল এবং বিভিন্ন এলাকা থেকে যে মানুষগুলোকে ধরে নিয়ে আসা হতো তাদেরকে সে জবাই করত। আমাকে তার সামনে অনেক সময় বসিয়ে রাখা হয়। তারপর সে আমার মেজ ছেলের নাম জানতে চায়। এরপর বলে যে, সে মুক্তিযোদ্ধা হয়েছে এবং ভারতে গেছে। আমি সাথে সাথে অস্বীকার করি এবং বলি যে, সে কুষ্টিয়াতে চাচার বাসায় আছে।”

গোবিন্দ ঘোষ: জবানবন্দি

গোবিন্দ ঘোষ জানান, আষাঢ় মাসে তাদের ও চিত্ত ঘোষের বাড়িতে ডাকাতি হয়। কারা ডাকাত তা বোবা যায়নি। মহেন্দ্রপুর অভিযানের দিন (আশ্বিন মাসে) আর্মি ঘোষপাড়াতে পূর্ণ ঘোষকে হত্যা করে।

গোবিন্দ ঘোষ জানান, মোল্লাপাড়াতে গফুর মোল্লা মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার কারণে তাঁর বাবা আকবর মোল্লা ও চাচা জবাবার মোল্লাকে ধরে নিয়ে যায়। জবাবার মোল্লার

দুই ছেলে সিরাজ মোল্লা ও সামসু মোল্লাকে পলায়নরত অবস্থায় গুলি করে। তারপরও সিরাজ মোল্লা উঠতে গেলে তাকে গুলি করে মারা হয়। জবাব মোল্লা ও আকবর মোল্লাকে কুমারখালী নিয়ে হত্যা করে। তবে ওই দিন শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান মজিবর মুস্তী তাঁর বাবাকে আগেই সংবাদ দেয় এবং অন্যের বাড়িতে আগুন দিলেও তাঁদের বাড়িতে আগুন দিতে দেয়নি। গফুর মোল্লা মুক্তিযুদ্ধে ট্রেনিং নেওয়া এবং অন্তর্বাখার কথা চেয়ারম্যানকে আগেই জানিয়েছিলেন। তাছাড়া চেয়ারম্যানের সঙ্গে সব সময়ই গোবিন্দ ঘোষ যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন।

গোবিন্দ ঘোষ জানান, তিনি মহেন্দ্রপুর অভিযানের দিন সানু সর্দারের বাড়িতে আশ্রয় নেন। ওই দিন সুনীল ঘোষ, সুশীল ঘোষ, গোপাল ঘোষ, সূর্য ঘোষের বাড়ি পোড়ানো হয়। আর্মি দেখেই সবাই বিভিন্ন দিকে পালাতে থাকে। এছাড়া একবার তারা (পরিবারের লোক) এহেদ প্রামাণিকের বাড়িতে পাঁচ-ছয় রাত ছিলেন। খুব ভোরে বাড়ি এসে সারা দিন থাকতেন। আবার সন্ধ্যায় চলে যেতেন।

আর্মির আগমন

সামসুন্নাহার নিলু (৫০) জানান, সাধুঘাঁটিতে (শৈলকুপা) তাঁরা দুলাভাইয়ের বাড়িতে ছিলেন। একদিন পাশের গ্রাম পাইকপাড়াতে আর্মি আগুন দিতে থাকে। জোতদার দুলাভাই বাড়ির ছাগলগুলো নিয়ে বাথানে চলে যাওয়ার আগে নিলুর বোনকে বলেন, ‘যদি ওরা (পাকিস্তানি আর্মি) এসেই পড়ে, তাহলে ছেলেমেয়েদের শুইয়ে দিয়ে কাঁদবে, আর মাথায় পানি দিতে থাকবে। জ্বরের ভান করে কাঁথা দিয়ে ঢেকে দিবে। জ্বর-ম্যালেরিয়া হয়েছে দেখলে আর্মি চলে যাবে।’

রাজাকাররা একবার উজানগ্রাম বাজারে হাট চলা অবস্থায় আর্মি নিয়ে আসে। আর্মি ঢুকেই এলোপাতাড়ি গুলি করতে থাকে। এতে শুণ্ডবাড়ি থেকে আসার পথে কন্দপৰ্দিয়ার খবির গুলি লেগে মারা যান। অজ্ঞাত আরো একজন মারা যান। আর একজনের পিঠের নিচের দিকে গুলি লাগে। এছাড়া পলায়নরত অবস্থায় রহমানকে মেরে ফেলে।

বেঁচে যাওয়া

কর্মজীবী যেসব হিন্দু ভারতে যেতে পারেনি কিংবা যায়নি তারা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের মাধ্যমে ‘আইডেন্টিটি কার্ড’ করত, যা তাদের বিপদের মুখে সহায়তা করত।

শান্তি কমিটির সঙ্গে যাদের যোগাযোগ ছিল কেবল তারাই কার্ড পেয়েছে। যেমন শ্রীপুরের যতীন মণ্ডলের ভাই কার্ড করতে পারলেও পান্তির হাজারী মণ্ডল

অনেক কষ্টের পরও তা করতে ব্যর্থ হন। তাঁর বিরলদে অভিযোগ করা ছিল, তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়ান। এক রাতে মুক্তিযোদ্ধা কেসমত কিছু সময়ের জন্য তার বাড়িতে এসেছিলেন ও অন্তর্টা এক বেলার জন্য বাড়ির পাশে রেখে গিয়েছিলেন। কীভাবে যেন এটা জানাজানি হয়ে যায় ও তাঁকে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর রাতে বাড়িতে থাকা নিরাপদ নয় ভেবে তিনি তোফাজেল মৌলভির বাড়িতে কয়েক রাত, ইব্রাহিম বিশ্বাসের বাড়িতে কয়েক রাত কাটান। বাড়ির মেয়েসহ বেশির ভাগ লোককে বিভিপাড়ার জলিল কারিকরের বাড়িতে রাখা হয়।

হাজারী মণ্ডলের বেঁচে যাওয়া

পান্তি বাজার পোড়ানোর দিন রান্না করার জন্য পাশের বাড়ির মাছ ব্যবসায়ী হারান একটা ইলিশ মাছ হাজারী মণ্ডলকে দেয়। এমন সময় সেনাবাহিনী বাজারে এসেছে শুনে ও পাশে আগুনের ধোঁয়া দেখতে পেয়ে যে যার মতো দৌড়ে বিভিপাড়া যান। পরে ছেলে সুবোধকে চুলার গোড়ায় শোয়ায়ে রেখে পালিয়ে যাওয়ার কথা মনে হয় হাজারী মণ্ডল ও তার স্ত্রীর। তাঁরা ফিরে এসে দেখেন, চুলার গরমে বাচ্চার পিঠ পুড়ে গেছে। এখনো (২০০৩ সাল) সে পোড়ার দাগ আছে।

হাজারী মণ্ডল বলেন, “সারা সপ্তাহে বাড়িতে মাকু তৈরি করে শনিবারে কুমারখালী বিক্রি করতে যেতাম। একদিন বিক্রি করে ২২ সের চাল কিনি, সাথে ছিল আমার বড় ছেলে, যে তখন বেশ ছোট। খেয়াঘাটে আসার পর দেখি যে ভাঁড়ি-ধর্মপাড়াতে অভিযান চালিয়ে আর্মি-বিহারিরা (আর্মির সঙ্গে কৃষ্ণিয়ার কয়েকজন অবাঙালি ছিল) ঘাটে এসেছে। খেয়া থেকে নামতেই এক বিহারি এসে বলে লাইন দাও। আমি ছিলাম ছয় জনের পরে। আমার আগের সবাই মুসলমান।

“আমি দেখলাম যে, আজ আর বাঁচতে পারছি না। ছেলের হাতে চাল দিয়ে বললাম, আব্দের ক্ষেত্রে মধ্য দিয়ে চাল নিয়ে বাড়ি যা। আর বলবি, বাবাকে মেরে ফেলেছে। বিহারিরা যখন আমার আগের চারজনকে জিজ্ঞাসা করে, তখন এক আর্মি বলল, এরা সবাই মুসলমান। সবাইকে কলেমা পড়তে বলে। আমিও সবার সাথে পড়লাম। এক বিহারি বলল, কাপড় খুলতে হবে। তখন লাইনের প্রথমে থাকা ধর্মপরায়ণ সৈয়দ আনসারী বলেন, ‘আমরা মুসলমান, বেইজ্জতি হতে পারব না, না হলে তোমরা গুলি করো।’ তখন আর্মি এসে সেই অবাঙালিকে ঢড় দিয়ে সরিয়ে দেয়। আমরা সবাই চলে আসি। বাড়ি এসে দেখি সবাই কান্নাকাটি করছে।”